Gmail

Ucaliptas <ucaliptas909@gmail.com>

গল্প-৩: শ্মশান ঘাট

1 message

Mohammad Sheikh Zohurul Islam <mszi065045@gmail.com>
To: ucaliptas909@gmail.com

Fri, Nov 29, 2024 at 2:57 PM

শীতের রাত। প্রায় এগারোটার মতো বাজে। ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা শেষ। রেজাল্ট দিতে এখনো বেশ দেরি। সারাদিন শুয়ে-বসে, ঘুরে-ফিরেও যেনো সময় আর কাটতে চায় না। একদম হাঁপিয়ে উঠেছি আমরা।

রাজু, সুমন, সোহান, টুটুল আর আমি। ইউনিভার্সিটির হলে আমরা পাঁচ বন্ধু মিলে গল্প করছিলাম। ভুতের গল্প। রাজু ওর এলাকার একটি পুরোনো শ্মশান ঘাটের গল্প বলছিলো। ডাকাতির অপরাধে কিভাবে দুইজন জলজ্যান্ত মানুষকে শ্মশান ঘাটে পুড়িয়ে মারা হয়, তার গল্পই শুনছিলাম ওর কাছে।

যে দুই ডাকাতকে পুড়িয়ে মারা হয়, তারা নাকি আপন দুই ভাই ছিলো। এখনো তাদেরকে শ্মশানের আশেপাশে লোকজন মাঝে মাঝে নাকি দেখতে পায়। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানুষের রুপ ধরে আসে। কখনো বা জীবজন্তুর রুপ ধরেও আসে।

রাজু ওই ডাকাতদের কখনো দেখে নি। আর ও দেখবেই বা কিভাবে, ওর জন্মেরও নাকি অন্তত বিশ বছর আগে সেই ডাকাত দুইজনকে পুড়িয়ে মারা হয়। আর তাছাড়া ছোটবেলা থেকেই ও ঢাকাতে বড় হয়েছে আর ঢাকাতেই ওর জন্ম। ওর মা-বাবা, ভাইবোন সবাই এখানেই থাকে। ঢাকাতে ওদের নিজস্ব বাড়ি আছে। তবে রাজুর দাদা-দাদী, কাকা-কাকীরা গ্রামের বাড়িতেই থাকে। আর এই গল্পটি ও ওর বাবা-মার মুখে শুনেছে।

রাজুর মুখে ডাকাত পুড়িয়ে মারার আর তাদের এখনো মাঝে মাঝে ওই শ্মশানের আশেপাশে আবির্ভাবের গল্পটা সুমন, সোহান, টুটুল আর আমার মনে এক আগ্রহের জন্ম দেয়। কৌতুহল বোধ করি আমরা।

আচ্ছা, আমাদের তো এখন ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা শেষ। হাতে সময়ও আছে প্রচুর। চল না, আমরা তাহলে রাজুর গ্রামের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি।-সুমন প্রস্তাবটি আমাদেরকে দেয়।

আমি বাকিদের মুখের দিকে তাকালাম। সুমনের প্রস্তাবের বিপরীতে ওদের কি প্রতিক্রিয়া হয়, তা বুঝার চেষ্টা করলাম। ওদের চোখেমুখে বেশ কৌতুহল বোঝা যাচ্ছে।

যাওয়া যেতে পারে। যদি রাজু আমাদেরকে নিয়ে যেতে রাজি হয়। আমি বললাম।

কিরে রাজু, আমাদেরকে তোর গ্রামের বাড়ি বেড়াতে নিয়ে যাবি না? টুটুলের জিজ্ঞাসা।

এতে তোর গ্রামের বাড়িও ঘুরে আসা যাবে আর সেই সাথে ওই শ্মশানটিও দেখে আসা যাবে। কি বলিস রাজু? সুমন আবার রাজু কে জিজ্ঞাসা করে।

" হ্যাঁ, এটি তুই খুব ভালো বলেছিস সুমন।"- সুমন এর কথায় তাল দেয় সোহান।

রাজু যদিও ওই শ্মশানটির ব্যাপারে অনেক বার তার মা-বাবার কাছে শুনেছে। কিন্তু শ্মশানটি এখন পর্যন্ত নিজের চোখে দেখে নি। তাই রাজু প্রথমে কি যেনো ভেবে আমাদের কথায় রাজি হয়ে যায়।

রাজুর গ্রামের বাড়ি ঠাকুরগাঁয়ের কোনো একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে। গ্রামের নাম ধর্মপুর। আমরা সবাই মিলে স্থির করলাম, রাজুর গ্রামের বাড়িতে অমাবস্যা তিথিতে যাবো। পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা তাই এক রাতে অমাবস্যা তিথিতে ঢাকা থেকে ঠাকুরগাঁওয়ের উদ্দেশ্যে ট্রেনে করে রওনা দেই।

রাজুর গ্রামে যাওয়ার আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হলো সেই শ্মশানটি দেখা। যেখানে ডাকাত জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। ডাকাতের বাড়ি নাকি রাজুদের গ্রামের বাড়ির দুই গ্রাম পরেই। আর আমরা ঠাকুরগাঁওয়ের যে স্টেশনে নামবো, তার দুই স্টেশন আগে যে স্টেশন টা রয়েছে, বিলাসপুর। সেই স্টেশনেও নাকি এই ডাকাতেরা বেশ কয়েকবার ডাকাতি করেছিলো। কয়েকজন কে নাকি কুঁপিয়ে মেরেও ফেলেছিলো এখানে।

এইজন্য আমরা বাস ছেড়ে ট্রেনকেই বেছে নেই। উদ্দেশ্য সেই স্টেশনটাও দেখবো। আমরা ঢাকা থেকে সকাল এগারোটার দিকে রওনা দেই। রাজু ওর চাচাতো ভাইদেরকে আমাদেরকে স্টেশনে নিতে আসার জন্য আগেই বলে দিয়েছে।

ট্রেন ছাড়লো। ব্যস্ত ঢাকার কোলাহল ছাপিয়ে ট্রেন এখন গ্রামের ভেতর দিয়ে ছুটে চলেছে। দুইপাশে অসংখ্য গ্রাম। সবুজ ধানের ক্ষেত। ফসলের ক্ষেত, পুকুর, নদী পেরিয়ে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে চলেছি। এমন মুহূর্তে মনে পড়ে গেলো কবি শামছুর রাহমানের কবিতার কয়েকটি লাইন-

"ঝক ঝকা ঝক ট্রেন চলেছে
রাত দুপুরে অই,
ট্রেন চলেছে ট্রেন চলেছে
ট্রেনের বাড়ি কই?
একটু জিরোয় ফের ছুটে যায়
মাঠ পেরুলেই......."
হাঁড়কাপানি শীতের তীব্রতায় বাকি লাইনগুলোও মনের ভেতরে ঘুমিয়ে পড়েছে যেনো। আর মনে করতে পারলাম না।

ট্রেন দ্রুত গতিতে ছুটে চলার জন্য শীত যেনো আমাদের উপরে আরো জেঁকে বসছে। ব্যাগ থেকে মোটা সোয়েটার বের করে গাঁয়ে দিলাম। তবুও শীত লাগছে। চাঁদর বের করে গায়ে দিলাম। এখন তবু শীত যেনো কিছুটা কম লাগছে।

দুপুর গড়িয়ে, বিকেল পেরিয়ে, সন্ধ্যা মাড়িয়ে রাত যখন প্রায় দশটার কাছাকাছি, তখন আমাদের ট্রেন ঠাকুরগাঁওয়ের বিলাসপুর স্টেশনে পৌছালো। আগ্রহ নিয়ে ট্রেনের জানালা দিয়ে মাথা বের করে ডাকাতের ডাকাতির সেই স্টেশনটা দেখছিলাম। কে বলবে এমন একটা স্টেশনে এমন একটি ঘটনা ঘটেছে। ব্যস্ত একটি স্টেশন। মানুষে গিজগিজ করছে। চারপাশে লাইটের আলোয় দিনের মতো লাগছে। পুরো সরগরম। এমন সময়ে হাঁকডাক শুনতে পেলাম, "এই চা গরম চা গরম।। চা খাবেন নি চা?"

আমরা পাঁচ বন্ধু চা খেয়ে শরীরটা একটু গরম করে নিলাম।

চা ওয়ালা লোকটার দিকে নজর পড়তেই দেখলাম, একটা বেঁটেমোটা, ক্ষীণ স্বাস্থ্যওয়ালা একজন লোক। লোকটার চোখ দুটো কোটরে ঢুকে আছে যেনো। গোঁফটা একটু বড়। গায়ে তার একটি কালো চাদর। মুখে কষ্টের ছাপ স্পষ্ট। দারিদ্রতার রোষানলের জন্যই হয়তো এই ছাপ। তাকে দেখে বড্ড মায়া হলো। লোকটার বিল চুকিয়ে দিলাম।

ট্রেন আবার ছেড়ে দিলো। রাত প্রায় এগারোটার দিকে আমরা আমাদের গন্তব্য "লাক্ষাদিয়া রেল স্টেশনে" পৌঁছে গেলাম। স্টেশনে পৌঁছেই আমরা রাজুর দুই চাচাতো ভাইকে দেখি।

রাজীব আর সজীব। আপন দুই ভাই। রাজীব বড় আর সজীব ছোট৷ রাজীব এবার দশম শ্রেণিতে আর সজীব অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। দুই ভাই-ই

উন্নত স্বাস্থ্যের অধিকারী। বেশ শক্তপোক্ত, নাদুস-নুদুস চেহারা। কথাবার্তা বেশ মিষ্টি। আমরা ওদের সাথে বাড়ি চলে গেলাম।

রাজুদের গ্রামের বাড়িটি খুব সুন্দর। নীরব শান্ত পরিবেশ। বাড়ির পূর্ব পাশে সবুজ মাঠ। রাস্তার দুই পাশে সারি সারি গাছ। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে শান্ত নদী, বৈচি। শহরের কোলাহল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমরা এরকম একটি শান্ত-সুনিবিড় গ্রামই খুঁজছিলাম।

রাজুর দাদা-দাদী, চাচা-চাচী, আর চাচাতো ভাই-বোনেরা আমাদেরকে আপন করে কাছে টেনে নেয়। যেনো আমরা সবাই ওদের কত কাছের। কত আপন। আমরাও রাজুদের গ্রামে এসে খুবই খুশি। উচ্ছ্বসিত।

সন্ধ্যার পর আমরা খাবার খেয়ে রাজুর চাচাতো ভাই-বোনদের সাথে বিভিন্ন ধরনের গল্পগুজব করলাম। তারপর সেই শ্মশান নিয়েও কথা বললাম। সে ব্যাপারে আমরা ওদের কাছে জানতে চাইলাম অনেক কিছু।

ঠিক হয় আমরা পরেরদিন গ্রামে ঘুরতে বের হবো।

পরের দিন বিকেলে আমরা পাঁচবন্ধু রাজুর দুই চাচাতো ভাইকে সাথে নিয়ে গ্রামে ঘুরতে বের হই। রাজুর দুই চাচাতো ভাই আমদেরকে ঘুরে ঘুরে সবকিছু দেখায়।

সুন্দর একটা গ্রাম। গ্রামের উত্তর আর দক্ষিণ পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে গেছে বৈচি নদী। আঁকাবাঁকা সরু পথ। ছেলেমেয়েরা মাঠে খেলছে। কৃষকেরা ব্যস্ত ক্ষেতের কাজে।

গ্রামে ঘুরার সময় আমরা লোকেদের কাছে জানতে পারি, গ্রামের উত্তর পাশে নদীর ধারে বহু বছরের পুরনো একটি শ্মশান ঘাট আছে। যেখানে বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনার কথা শোনা যায়। সন্ধ্যার কিছু আগে থেকেই গ্রামের লোকজন ওই শ্মশানের আশেপাশে যেতে সাহস করে না। কারন তারা এই শ্মশানের কথা খুব ভালো করেই জানে। এটিই রাজুর বলা সেই শ্মশান ঘাট।

পাখির কলকাকলিতে মুখরিত চারপাশ। আশপাশ দেখতে দেখতে আমরা সামনে এগিয়ে যাই। এমন সময় টুটুল বলে-

চল, আমরা শ্মশানের দিকে যাই।

না, ওখানে এখন যাবেন না। রাজুর চাচাতো ভাই রাজীব বলে।

কেনো? ওখানে গেলে কি সমস্যা?- সোহানের প্রশ্ন।

জায়গাটা মোটেও ভালো নয়- কিছুটা ভীত হয়ে বলে রাজীবের ভাই সজীব।

ভয় পাচ্ছো নাকি তোমরা? শুনেছি গ্রামের ছেলেরা নাকি অনেক সাহসী হয়। কিন্তু তোমরা তো মনে হয় একেকটা ভীতুর ডিম। সজীব আর রাজীব কে তাচ্ছিল্য করে বললো টুটুল।

হ্যাঁ, চলো তো৷ কিছুই হবে না। আমরা সেখানে গিয়ে শ্মশানটা একটু দেখতে চাই। সোহান উদগ্রীব হয়ে বলে।

না ভাই, দয়া করে এখন যাবেন না। যদি দেখতেই চান, তাহলে কালকে নাহয় যাবেন। কিন্তু এখন যাবেন না। সজীব আবার আমাদেরকে সাবধান করে।

এখন গেলে কি কোনো সমস্যা আছে নাকি? আমি জিজ্ঞাসা করি।

হ্যাঁ। এই সময়ে শ্মশানের ওই দিকে কেউ ই যায় না। জায়গাটা ভয়ঙ্কর। অনেক ভয়ঙ্কর কিছু দেখা যায় সেখানে। আবারো সজীবের উত্তর।

রাজুর মনে এবার কিছুটা যেনো ভয় জাগে। ও তখন আমাদের কে বললো- আচ্ছা চল, আমরা আজকে বাড়ি চলে যাই। কালকে নাহয়

আমরা ওখানে গিয়ে দেখে আসবো।

রাজুর কথায় একমত হয়ে আমরা সেদিন বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য মনস্থির করি। আমরা বাড়ির দিকে রওনা হই। তখন সন্ধ্যা প্রায় ছুই ছুই অবস্থা।

আমরা শ্মশান থেকে কিছুটা দূরে এগিয়েছি। তখন রাজীবের গ্রামের এক বন্ধু, রইস এর সাথে আমাদের দেখা হয়ে যায়।

ওর সাথে রাজীব কিছুক্ষণ কথা বলে। আমাদের ব্যাপারে জানতে চায়। রাজীব ওর বন্ধুর সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। রাজীবের বন্ধু আমাদেরকে তার বাড়িতে যাওয়ার জন্য বলে। আমরা প্রথমে যেতে না চাইলে রাজীব আমাদের বলে যে, বিলাসপুর স্টেশনে ডাকাতেরা কুপিয়ে যে কয়জন কে মেরে ফেলেছে, তার মধ্যে রইসের বাবাও একজন ছিলো। রইসের বাবাও সেদিন বিলাসপুর স্টেশনে ডাকাতের কবলে পড়ে বেঘোরে প্রাণ টা হারায়। রাজীবের কাছে এ কথা শুনার পরে আমরা রইসের বাড়িতে যাই।

অল্প একটু জায়গার উপরে ছোট একটি বাড়ি। থাকার জন্য দুইটা ঘর। একটা দক্ষিণ দিকে, আরেকটা পূর্ব দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। দক্ষিণ পাশে ছোট একটা রান্নাঘর। বাড়িঘরের অবস্থা জরাজীর্ণ। রইসদের অবস্থা যে খুব একটা ভালো নয়, তা আর কারোর বুঝতে বাকি থাকে না। রইস আগে রাজীবের সাথে একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়তো। কিন্তু অভাবের কারনে আর পড়াশোনা করতে পারে নি। পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে অল্প বয়সেই তাকে পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হয়েছে। সে তার গ্রাম থেকে অল্প কিছু দূরে একটা মিলে চাকরি করে।

দারিদ্রতা গ্রাস করলেও আমাদের আপ্যায়নের কোনো ত্রুটি রাখে নি রইস। আমাদের জন্য চা নাস্তা, বাড়ির গাছের ফল, এটা-সেটা নিয়ে এলো। ছোট ভাইকে বিস্কুট আনতে পাশের একটা দোকানে পাঠিয়ে দিলো।

কথাবার্তা বলে, চা-নাস্তা খেয়ে আমরা রইসদের বাড়ি থেকে চলে আসবো, এমন সময় রইস আমাদেরকে দেখানোর জন্য একটা ছবি নিয়ে আসে। ওর বাবার ছবি। একটু ভালো করে দেখতেই ছবিতে আমার চোখ আটকে যায়। আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই। ছবিটি আর কারোর নয়, যাকে আমরা বিলাসপুর রেল স্টেশনে দেখে এসেছি। সেই চা ওয়ালা লোকটা!!!

সেই একই চেহারা, দূর্বল -ক্ষীণ স্বাস্থ্য, গোঁফটা একটু বড় বড়।

আমার অবস্থা দেখে আমার বন্ধুরা ছবিটি আমার হাতে থেকে নিয়ে দেখতেই ওরাও স্তম্ভিত হয়ে যায়। যেনো আমরা সবাই আকাশ থেকে পড়লাম।

রেল স্টেশনে আমরা তাহলে কাকে দেখে এলাম?
যার অস্তিত্ব ই কিনা এই পৃথিবীতে আর নেই, তাকে আমরা স্টেশনে কিভাবে দেখে এলাম? সে কি তাহলে কোনো মানব নয়? অশরীরী কেউ?

রক্তের মধ্যে দিয়ে ভয়ের স্রোত বয়ে গেলো। শিহরণ খেলে গেলো আমাদের শিরা-উপশিরায়। বন্ধুরা একে অপরের দিকে তাকালাম। কারো মুখে কোনো কথা নেই। যেনো কথা বলতেই ভূলে গেছি আমরা।

স্টেশনে আমাদের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা রাজীব, সজীব আর রইসকে খুলে বললাম। আমাদের কাছে ঘটনা শুনে রইস বললো, ডাকাতেরা সেদিন এগারোজন কে মেরে ফেলে। যারা মারা যায়, তাদের মধ্যে আটজনই ছিলো গরীব-অসহায়, খেটে-খাওয়া মানুষ। ওই ঘটনার পর থেকে তাদের কে ওই স্টেশনে বহুবার দেখা গেছে। এখনো তাদেরকে দেখা যায়। কখনো নিজের রুপে, কখনো বা অন্য কোনো রুপে। কিন্তু তারা কারোর কোনো ক্ষতি করে না। কারণ, যারা ট্রেনের যাত্রী হয়, তারা তো তাদেরই মতো নিরীহ। তবে যারা খারাপ কোনো উদ্দেশ্যে স্টেশনে আসে, তাদের কে কোনোভাবেই ছাড় দেয় না। তাদেরকে শাস্তি দেয়।

মনের মধ্যে এক ভয় ও উত্তেজনা নিয়ে আমরা রাজীবদের বাড়ি চলে গেলাম। অনেক রাত পর্যন্ত এই নিয়ে আমরা অনেকক্ষণ কথা বললাম। স্টেশন আর শ্মশানের মধ্যে এক যোগসাজশের গন্ধ অনুভব করলাম। এজন্য আমরা ঠিক করলাম, যে করেই হোক, শ্মশানে আমাদের যেতে হবেই। আমরা দেখতে চাই যে, ওখানে আসলে কোনো ঘটনা ঘটে কিনা।

পরের দিন আমাদের ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হয়। আমরা সকালের দিকেই বের হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু রাজীব আর সজীব তখন স্কুলে গিয়েছে। এইজন্য সকালে আর যাওয়া হলো না। বিকেলে যেতে হবে। কারন ওদের স্কুল ছুটি হবে বিকালে। এজন্য আমরা পাঁচ বন্ধু একটু নদীর দিকে ঘুরতে যাই।

শান্ত নদী। বেশ গভীর বলেই মনে হলো। কলকল শব্দে বয়ে চলেছে। খুব একটা বেশি চওড়া নয়। চওড়ায় ৩০০ মিটারের মতো হবে। শীতকাল বলে নদীর পানি অনেক কমে গেছে। নদীতে অনেক ইঞ্জিন চালিত নৌকা ছুটে চলেছে। দূরে কিংবা কাছে। অনেক ছোট ছোট নৌকাও দেখলাম। কিছু নৌকা দিয়ে লোকজন খেয়া পারাপার হচ্ছে। আর কিছু ডিঙি নৌকা। জেলেরা সেগুলো নিয়ে নদীতে মাছ ধরছে। মাথার উপরে নীল আকাশ। আকাশের নীল আজ যেনো তাম্রবর্ণ ধারণ করেছে। কি জানি, শীতকাল বলেই কিনা।

নদীর পাড়ে আমরা একটা বড় বট গাছের নিচে ঘাসের উপর বসে গল্প করছিলাম। এই নদীর পাড় ধরে হেঁটে গেলেই নাকি সেই শ্মশানটি সামনে পড়বে।

গল্প শেষ করে বিকেল হওয়ার আগেই আমরা এবার বাড়ির দিকেই ফিরছিলাম। বেলতলা জামে মসজিদের আগে একটা চার রাস্তার মোড় আছে। জায়গাটা বেশ নির্জন। দুই পাশে বাঁশঝাড়। এখান থেকে মোড় নিয়ে ডানে দশ মিনিটের মতো হেঁটে গেলেই শ্মশান পড়বে। আর বামে মোড় নিয়ে পাঁচ মিনিটের মতো গেলে রাজুর দাদা বাড়ি। আর সোজা গেলে বৈচি নদী। আমরা যখন এখান থেকে মোড় নিতে যাবো, তখন দেখি রাজীব আর সজীব ওদের বাড়ির দিক থেকে আমাদের দিকে আসছে।

ওরা কাছে আসতেই রাজু ওদের জিজ্ঞাসা করলো-

কিরে রাজীব, তোরা না বললি তোদের স্কুল বিকাল চারটার সময় ছুটি হবে?

হ্যাঁ ভাইয়া, আমাদের স্কুল চারটার সময় ই ছুটি হওয়ার কথা। কিন্তু আমাদের স্কুলে এখন খেলা চলছে। এজন্য ক্লাস হচ্ছে না দেখে আমরা তাড়াতাড়ি ই চলে এসেছি।- সজীব উত্তর দিলো।

তাহলে ভাইয়া চলো, যাওয়া যাক। রাজীব রাজু কে বলে।

কোথায়? রাজু ওকে জিজ্ঞাসা করে।

তোমরা না আজকে শ্মশান দেখতে যেতে চাইলে। আবারো রাজীবের উত্তর।

রাজু বললো- "কিন্তু বাসায় গিয়ে কাকা-কাকী কে বলে আসি?"

না ভাইয়া, তোমরা ওখানে যাবে শুনলে আব্বা-মা তো তোমাদেরকে ওখানে যেতেই দিবে না। আমরা যে ওখানে যাচ্ছি, আব্বা-মা তো এটি জানেই না। জানলে রক্ষে থাকবে না। সজীব বলে।

আমরা আর বাড়ি গেলাম না। এখন বাড়ি গিয়ে ওদের বাবা-মাকে এসব কথা বলে শুধু শুধু ঝামেলা বাড়াতে চাইলাম না। আমরা সেখান থেকেই শ্মশানের দিকে রওনা দেই।

আমরা খেয়াল করলাম, চৌরাস্তার মোড় থেকে শ্মশান পর্যন্ত পুরো রাস্তাটাই বেশ নির্জন। মাঝে মাঝে দুয়েকটা পাখির ডাক ছাড়া আর

কোনো কিছুর শব্দ নেই। যাওয়ার সময় ওরা দুইজন বারবার আমাদেরকে সাবধান করে দেয়। বলে -

আপনারা আমাদের এলাকায় নতুন আসছেন। তাই আপনারা এখানকার কিছুই জানেন না। শ্মশানের গিয়ে কোনো কিছুতে হাত দিবেন না।

আমরা ওদের কথা শুনতে শুনতে সামনে এগিয়ে যাচ্ছি। বেশ কিছুটা এসে এখান থেকে আরেকটা রাস্তা অন্যদিকে চলে গেছে। ওখানে গিয়ে রইসের সাথে আমাদের দেখা হয়ে গেলো। রাস্তাটা রইসদের বাড়ির ওইদিক দিয়েই চলে গেছে। আমরা কোথায় যাচ্ছি জানতে চাইলে রইস কে আমাদের বৃত্তান্ত বললাম। আর রইস কে বলে-কয়ে আমাদের সাথে করে নিয়ে যাই। যতো লোক থাকবে মনে সাহস ততো বাড়বে। এখন আমরা আটজন হয়ে মনে অনেক বেশি সাহস পেলাম।

শ্মশানের উদ্দেশ্যে আমরা রওনা হলাম। যেতে যেতে আমাদের মনে ভয় এবং উত্তেজনা একসাথে কাজ করতে লাগলো। আমরা অবশেষে শ্মশানের গেটের সামনে এসে পৌঁছালাম। গেটটি অনেক পুরোনো। মরিচা ধরে গেছে। মরিচা ধরে গেটের জায়গায় জায়গায় ফুটো হয়ে গেছে। সামান্য ধাক্কা দিতেই গেটটি খুলে গেলো।

অ্যাই ছেলেরা!

কথাটি শুনে আমরা সবাই পেছন ফিরে তাকালাম।

দেখলাম আমাদের পিছনে একজন লম্বা মতো লোক। স্বাস্থ্যবান। কিন্তু দেখতে কালো।

তোমরা কোথায় যাচ্ছো? লোকটি জিজ্ঞাসা করলো।

জ্বি, আমরা শ্মশানের ভেতরে যাচ্ছি। আমি বললাম।

লোকটি আবার বললো- "কেনো? শ্মশানে তোমাদের কি দরকার?"

এই এমনিই একটু দেখতে যাচ্ছি। বললো রাজু।

এই জায়গাটা ভালো না। তোমরা এখান থেকে চলে যাও। এটাই তোমাদের জন্য সবচেয়ে ভালো হবে। লোকটা আমাদের সাবধান করলো।

আমি লোকটাকে বললাম- "আসলে আঙ্কেল, আমরা ঢাকা থেকে এখানে বেড়াতে এসেছি। তাই এই শ্মশানটি আমরা একটু দেখতে এসেছি।

ঠিক আছে তোমরা যাও। তবে ভেতরে বেশি দেরি কোরো না। আর তোমাদের একটা কথা বলি- " এই শ্মশানের ভেতরে একটা মন্দির আছে। তোমরা ওই মন্দিরের ভেতরে যেয়ো না। আর যদি মন্দিরের ভেতরে যাও। তাহলে কোনো মূর্তি বা কোনো কিছুতে হাত দিয়ো না। এই বলে লোকটি সেখান থেকে চলে গেলো।

আমরা শ্মশানের ভেতরে ঢুকলাম। গেটের বাম পাশে তিন ফুটের মতো উঁচু করে দেয়াল করা। দেয়ালের ভেতরে একটু উঁচু ঢিপির মতো কিছু কি যেনো দেখলাম। এগুলো কি জানতে চাইলে, সজীব বলে-

এগুলো হচ্ছে কবর। যেসব হিন্দুদের লাশ পোড়ানোর সামর্থ নেই, তারা এখানে লাশ কবর দেয়।

দেয়াল দিয়ে ঘেরা জায়গাটিতে অনেক উঁচু উঁচু মেহগনি, কড়ই, সেগুন আর শিমুল গাছ শ্মশানের রুক্ষতাকে কাটিয়ে যেনো আকাশ ছুঁতে চাইছে।
কবরগুলোর উপর গাছের পাতা পড়ে এক হাতের মতো পুর হয়ে গেছে।

“আহ, এই জায়গাটা তো ভীষণ রোমাঞ্চকর!” রাজু বললো।

আমার তো মনে চাচ্ছে যে, আমি এখানেই থেকে যাই।- টুটুলের গলায় উচ্ছ্বাস যেনো গলে গলে পড়ছে।

এমন সময় আমরা যেনো কোনো কিছুর শব্দ পেলাম। কারো হাঁটার শব্দ।

আমরা পিছন ফিরে তাকাই। দেখলাম একজন লোক শ্মশানের ভেতরে ঢুকলো। লোকটির স্বাস্থ্যও বেশ ভালো। পুরুষ্টু চেহারা। লোকটি আমাদের দিকে তাকিয়ে একটু দেখে তিনি তার মতো ভেতরের দিকে গেলেন। শ্মশানে কাজটাজ করতে লাগলেন।

রাজীব আর সজীব বললো ইনি এই শ্মশানের কর্তব্যরত ব্যাক্তি। এই শ্মশানের দেখাশোনা করেন।

যাক, এতোক্ষণে তাহলে এমন একজন কে পাওয়া গেলো। তিনি এখানে থাকলে আমাদের জন্য তো আরো ভালো। কোনো বিপদের মুখোমুখি হলে তিনি তো অন্তত এগিয়ে আসতে পারবেন। এটি ভেবে আমরা মনে আরো সাহস পেলাম।

আমরা সামনের দিকে একটু এগিয়ে গেলাম। শ্মশানের মাঝে ছোট একটি টিনের ঘর। ঘরের উত্তর আর দক্ষিণ পাশে বেড়ার সাথে কি যেনো টাঙানো। বোর্ডের মতো। সেখানে আমরা অনেকগুলো নাম দেখতে পেলাম। আমরা ওগুলো পড়ে বুঝলাম যে, এখানে যারা মারা গেছে বা যাদের পোড়ানো হয়েছে, এগুলো তাদেরই নাম।

এবার আমরা টিনের ঘর থেকে একটু পূর্ব দিকে গিয়ে উত্তরে দেয়াল ঘেরা কবরস্থানের কাছে গেলাম। এই কবরগুলো প্রথমে দেখা কবরগুলোর থেকে একটু বেশি উঁচু। আমরা কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কিছু কবরে লাগানো নামফলক থেকে তাদের নাম ও জন্ম-মৃত্যু তারিখ পড়তে শুরু করেছি যেই, এমন সময় হঠাৎই সোহান বলল-

ওই দেখ, ওখানে কী একটা আলো জ্বলছে!

সবাই সোহানের কাছে গেলাম। ও হাত দিয়ে যেদিকে ইশারা করছে সেদিকে তাকাতেই দেখলাম, টিনের ঘর থেকে পঞ্চাশ কি ষাট গজ দূরে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটা ছোট মন্দির। সেখান থেকে একটি অদ্ভুত সবুজ আলো আসছে। আমাদের কাছে প্রথমে ভ্রমের মতো মনে হলো। তারপর আমরা কাছে গিয়ে দেখতে পাই যে, আলোটা মন্দিরের ভিতর থেকেই আসছে।

চল, একটু দেখা যাক। টুটুল বললো।

আমরা মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলাম। মন্দিরের ভেতরে ঢুকতেই আমরা কিছু ভয়ানক ধরনের অদ্ভুত মূর্তি দেখতে পেলাম। রাক্ষসের দাঁতের মতো বড় বড় দাঁত মূর্তিগুলোর। চোখগুলো অনেক বড় বড়। জিহবা বের হয়ে রয়েছে। আমাদের মনে তখন একটু ভয় ভয় কাজ করছে। মূর্তিগুলো সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে ছিল। এমনভাবে তাকিয়ে ছিলো যেনো চোখ দিয়ে কাউকে গিলে খাবে। টুটুল আর সোহান একটা জিনিস খেয়াল করলো, মূর্তিগুলোর চোখ থেকে যেনো অশ্রু ঝরছিলো।

দেখ দেখ, মূর্তিগুলোর চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে। সোহান বললো।

তখন টুটুলও সোহানের সাথে তাল মিলিয়ে বললো- হ্যাঁ, তাই তো দেখছি। মনে হচ্ছে মূর্তিগুলো যেনো কাঁদছে।

কোথায়? তোরা মূর্তির চোখে পানি কোথায় দেখছিস? আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। রাজু বললো।

আমরাও কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আমি আর সুমন বললাম।

রাজীব কি জানি কি ভেবে বললো- "আমার মনে হয় এখান থেকে এখন আমাদের যাওয়া উচিত।

আমরা চলে যেতে চাইলেও টুটুল আর সোহান ওখানে আর কিছুক্ষণ দেরি করার কথা বলে।

সুমন বলে- এটি একটি অশুভ স্থান। আমাদের এখানে বেশিক্ষণ থাকা একদম ই উচিত নয়।

কিন্তু টুটুল মাথা নেড়ে বলল- দাঁড়া, অন্তত এই অদ্ভুত আলোর উৎস কোথায়, তা একটু দেখা যাক। এই বলে টুটুল মূর্তির দিকে এগিয়ে যায়। এগোতে গিয়ে নিচে পড়ে থাকা কিসের সাথে যেনো হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। পড়ে যাওয়ার সময় ওর সাথে লেগে একটা মূর্তির হাত ভেঙে যায়। রাজু ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে ওকে টেনে তুলে।

টুটুল উঠে দাঁড়িয়ে হাত-পা ঝাড়তে থাকে।

আমরা আমাদের মতো আবার সবুজ আলোর উৎস কোথায়, তা খুঁজতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরেই চারপাশে জোরে বাতাস বইতে শুরু করলো। প্রচন্ড ঝড় শুরু হয়ে গেলো। আমাদের মাঝে একধরনের শিহরণ তৈরি হলো। আমরা শুনতে পেলাম কিসের একটা চাঁপা আর্তনাদ। আমাদের হৃদস্পন্দন দ্রুত বাড়তে লাগলো। কিছুক্ষণ পরেই বাতাস আবার থেমে গেলো।

এটা কি? মুর্তির পাশে ত্রিশূলের মতো কি একটা দেখিয়ে রাজু ভীত হয়ে সজীবকে জিজ্ঞাসা করে।

আমি জানি না। চলো, এখান থেকে আমরা এখন চলে যাই। সজীবের উত্তর।

এমন সময় সোহান হঠাৎ চিৎকার করে বললো।-
ওই দেখ, মূর্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখ।

মন্দিরের ভেতরের মূর্তিগুলো যেনো তীব্র গর্জন করছে। আবার পুরো শ্মশানে তীব্র জোরে বাতাস বইতে লাগলো। চারপাশে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। আর আমরা সবাই যেনো অদৃশ্য কোনো শক্তির দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়লাম। মন্দিরের মূর্তিগুলো আমাদের দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। এবার মূর্তিগুলোর দিকে তাকাতেই দেখি ওখানে একজন ব্যক্তি ভয়ানক দৃষ্টিতে ক্রোধ নিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। ওই ব্যাক্তি আর কেউ নয়।

মন্দিরের বাইরে গেটের কাছে যে লোকটা আমাদের সাথে কথা বলছিলো। সে ত্রিশূল হাতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

দৌড়াও! রাজু বললো।

সবাই তখন মন্দিরের ভেতর থেকে পালাতে গেলাম। কিন্তু মন্দিরের দরজার কাছে যেতেই মন্দিরের দরজা জোরে একটা শব্দ হয়ে বন্ধ হয়ে গেলো। আমরা চিৎকার করছি। আর সবাই মিলে দরজা টেনে খোলার চেষ্টা করছি৷ কিন্তু পারছি না। তখন আমরা কোনো উপায়ান্তর না দেখে মন্দিরের ভেতর থেকে বের হওয়ার জন্য অন্য পথ খুঁজছি। এমন সময় সুমন টিনের একটা ফাঁক খুঁজে পেয়ে আমাদেরকে সেদিকে ডাকে। আমরা ওই টিনের ফাঁক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

বাইরে বেরিয়ে আসতেই আমরা দেখি ওখানে আরেকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরের কর্তব্যরত ব্যাক্তি। আমাদেরকে দেখে লোকটা একটা বিভৎস হাসি দেয়। আর বলে-
"তোরা আমার হাত ভেঙে দিয়েছিস। এখন তোদের প্রত্যেক কে আমি জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবো। এই বলে সে আমাদের দিকে তাকিয়ে আবার একটা বিভৎস - বিকট হাসি দেয়। তার হাসি যেনো চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। আকাশ - বাতাসে প্রতিধ্বনি হচ্ছে। লোকটি এবার টুটুলের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। আমি তখন আশেপাশে খুঁজে একটা ইট পেলাম। সেটি ছুঁড়ে মারি লোকটার গাঁয়ে।

সে একটু দূরে ছিটকে পড়ে যায়। তারপর দেখি ওখানে আচমকাই একটা লাশ। আর সেটি আগুনে দাউদাউ করে পুড়ছে। এবার আমাদের কারোর

ভেতরেই যেনো প্রাণ নেই। একরকম বিহ্বল হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। টুটুল মাটিতে আবার পড়ে গেলো। ওকে মাটি থেকে টেনে তুলেই আমরা দৌড় দিলাম।

কিন্তু কিছুতেই যেনো আমরা এগুতে পারছি না। এক অদৃশ্য শক্তির বলয় যেনো আমাদেরকে টেনে ধরেছে। আকৃষ্ট করে রেখেছে তার প্রতি।

হঠাৎ করে রাজুর আর্তনাদ ভেসে আসলো। রাজু বললো-" রাজীব আর সজীব কোথায়? ওদের কে দেখতে পাচ্ছি না।"

রইসকেও তো দেখতে পাচ্ছি না- সোহান বললো।

আমাদের মনে এক ভয়াবহ শিহরণ জাগলো। ওরা তাহলে কোথায় গেলো? ওদের তিনজন কে কি ওই আত্মাগুলো নিয়ে গেছে? মেরে ফেলেছে ওদের?

রাজু চুপ কর। কিছু ভাবতে দে। আমি বললাম।

কিন্তু আচমকাই, কবরের ওপর থেকে অদ্ভুত কিছু একটা আমরা দেখতে পেলাম। দেখতে পেলাম ওটি একটি মানুষ। কিন্তু তার চেহারা একেবারেই ভয়ানক। শরীর অর্ধেক যেনো ঝলসে গেছে। দুটি চোখের একটিও নেই। সে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

দৌড় দাও! এখান থেকে চলো!- টুটুল চিৎকার করে বললো। সবাই আমরা গেটের দিকে একসাথে দৌড়াতে লাগলাম। কিন্তু আমাদের পেছনে সেই ভয়ঙ্কর অর্ধ পুড়ে যাওয়া মানুষটি তখনও এগিয়ে আসছিলো। গেটও এদিকে বন্ধ হয়ে গেছে। খুলতে পারছি না।

আমরা জোরে জোরে চিৎকার করছি। তখন গেটের বাইরে অনেক শব্দ শুনতে পেলাম। গেট খুলে ভেতরে আসলো সজীব, রাজীব ও রইস। তাদের হাতে লাঠি আর টর্চ লাইট।

ওদের দেখে আমরা যেনো স্বস্তি ফিরে পেলাম।

কে ছিলো ওটা? আমি তো ভাবতেই পারছি না। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললো সোহান।

অবশেষে আমরা শ্মশানের মায়াজাল থেকে বাইরে বেরিয়ে আসলাম। যখন আমরা গ্রামের রাস্তার কাছে পৌঁছালাম। তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে।

রইস সেদিন আমাদের সাথে রাজীবদের বাড়িতেই থেকে যায়। বাড়ি ফেরার পরে রাজীব, সজীব আমাদের কে বললো-

"তোমাদেরকে বলেছিলাম আমাদেরকে ছাড়া তোমরা ওখানে যেয়ো না। তবুও তোমরা আমাদেরকে ছাড়াই নিজেরাই চলে গেলে?

সুমন আর সোহান বললো- " আমরা তোমাদের ছাড়া গেলাম কোথায়? তোমরা তিনজন ই তো আমাদেরকে শ্মশানে নিয়ে গেলে?

"আমরা আপনাদের ওখানে নিয়ে যাবো কিভাবে? আমরা আজ বাড়িতেই এসেছি ৬টার সময়...

আর আমি তো ভাই মিল থেকেই ফিরেছি ৬টার পরে। বাসায় এসে পৌছেছি বিশ মিনিটের মতো হয়েছে। তখন দেখি রাজীব আর সজীব আমার বাসায় আমাকে ডাকতে গিয়েছে। আপনাদের নাকি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তাই। তখন রাজীব বললো আপনারা নাকি আজ শ্মশানে যেতে চাইছিলেন। তখন আমরা আর দেরি না করে লাঠি আর টর্চ লাইট নিয়ে শ্মশানের দিকে দৌড় দেই।

মানে! কি বলছিস কি তুই? তোরা তার মানে আমাদেরকে ওখানে নিয়ে যাস নি? রাজু উত্তেজিত হয়ে বলে ওদের।

সজীব আবার বললো- ভাইয়া, আমরা তোমাদের ওখানে নিয়ে যাবো কিভাবে? আমাদের স্কুলে এখন খেলা চলছে। এজন্য আজ দুপুরেই ছুটি হয়েছে। স্কুল তাড়াতাড়ি ছুটি হওয়াতে আমরা দুই গ্রাম পরে সেই ডাকাতদের গ্রামে গিয়েছিলাম তাদের ছবি আনতে। তোমাদের দেখাবো বলে।

এনেছিস তোরা ছবি?- কৌতুহল নিয়ে রাজু জিজ্ঞাসা করে।

হ্যাঁ। এনেছি। এই দেখো। বলেই রাজু সেই আপন দুই ডাকাত ভাইয়ের ছবি এগিয়ে দেয় রাজুর দিকে।

ছবি দেখে রাজুর হাত থেকে সেটি নিচে পড়ে যায়। ওর মুখ হা হয়ে যায়।

এবার আমরা ছবিটা হাতে নিয়ে দেখি, শ্মশানের বাইরে গেটের কাছে যে লোকটা আমাদের সাথে কথা বলছিলো আর শ্মশানের কর্তব্যরত ব্যাক্তি; এই দুইজন ই হলো ছবির দুই ডাকাত ব্যাক্তি।

আমরা পুরোপুরি তাজ্জব হয়ে গেলাম। ডাকাতেরা তাহলে এই দুই ব্যাক্তির রুপ ধরেই আমাদের কাছে এসেছিলো! কি ভয়ানক ছিলো সেই মুহুর্ত! আমরা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিলাম না যে আমাদের সাথে এইরকম ভয়াবহ ঘটনা ঘটে গেছে। নিজের চোখকেই যেনো এখন বিশ্বাস হচ্ছে না।

রাজুর গ্রামের বাড়ি আমরা বেশ কিছুদিন থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমরা ঠিক করি তারপরের দিনই আমরা ঢাকা চলে আসবো। সবকিছু গুছিয়ে নিয়েছি। পরের দিন রাতে ট্রেনের টিকেট কেটে ট্রেনে উঠে পড়েছি।

শান্ত - সুনিবিড় ছায়াঢাকা গ্রাম পেরিয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে কোলাহলময় ব্যস্ত ঢাকার দিকে। রাতের অন্ধকারের বুক চিরে ছুটে চলেছে আমাদের ট্রেন। ট্রেন তার গতি বাড়িয়েই চলেছে ক্রমাগত। শীতের আমেজ লেগে রয়েছে আমাদের চোখে মুখে, সারা শরীরে। আমার ডানে সোহান আর জানালার পাশে টুটুল বসেছে। আর সামনে উল্টোদিকে আমার দিকে ঘুরে বসেছে রাজু আর ওর পাশে জানালার ধারে সুমন। আবেশে দুচোখে যেনো ঘুম জড়িয়ে আসছে। চোখ বন্ধ করে ঘুমাতে চেষ্টা করছি। তলিয়ে যাচ্ছি যেনো কোথায়। এমন সময় আমার কাঁধে কে যেনো হাত রাখলো। চোখ দুটো মেলে দেখি- আমার কাঁধে হাত রেখে মুচকি মুচকি হাসছে রইসের সেই চা ওয়ালা বাবা। আর আমাকে জিজ্ঞাসা করছে-

কি মামা, চা লাগবে নাকি?